অজ্ঞাত রচনা

# মাতৃভাষা এবং সাহিত্য

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

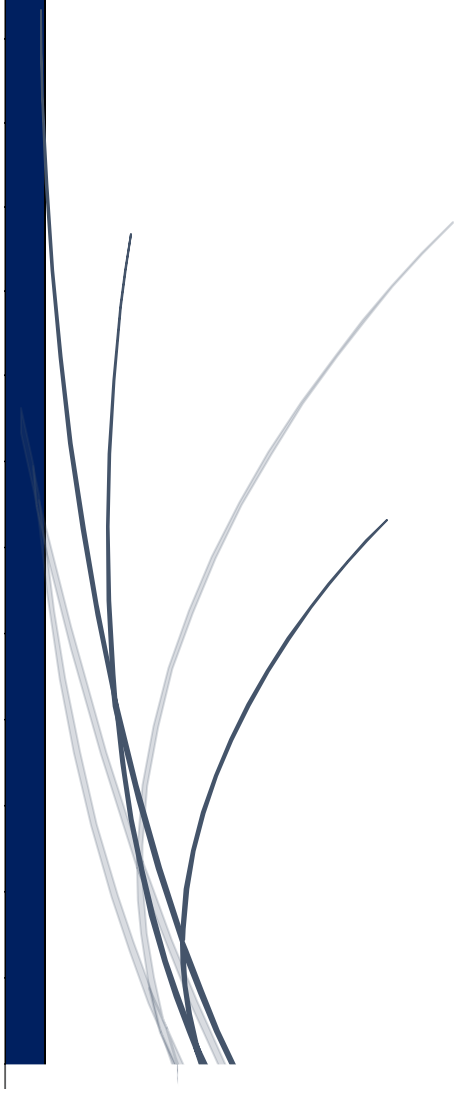

BENGALIEBOOK.COM
2021

# মাতৃভাষা এবং সাহিত্য

গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি যে সাহিত্যের সকল দিক ও বিভাগ লইয়া প্রকাণ্ড একটা কাণ্ড বাধাইয়া দিতে পারিব, আমার এমন কোন মহৎ উদ্দেশ্য বা ভরসা নাই। তবে মাতৃভাষা এবং সাহিত্যের সাধারণ ধর্ম এবং প্রকৃতি এই ক্ষুদ্র স্থানে যতটা সম্ভব, আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব মাত্র। আমার উদ্দেশ্য বৃহৎ নহে; অতএব যিনি বৃহৎ একটা আশা লইয়া আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পড়িতে বসিবেন। তাঁহার আশার তৃপ্তি সাধন করিতে আমি একান্ত অপারগ।

একটা কথা আমার অত্যন্ত দুঃখের সহিত মনে পড়িতেছে, আমার জীবনের আমি এমন দুই-একটা কৃতবিদ্য বাঙালীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিয়াছি, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলাই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও মাতৃভাষা জানা এবং না-জানার মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখিতে পাইতেন না। তাঁহারা সব-কটাই পাস করিয়াছেন এবং সরকারী চাকরিতে হাজার টাকা বেতন পাইতেছেন। অর্থাৎ যে-সব অদ্ভুত কাণ্ড করিতে পারিলে বাঙালী সমাজে মানুষ প্রাতঃস্মরণীয় হয়, তাঁহারা সেই-সব করিয়াছেন। অথচ, বাঙ্গালায় একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখিতে পারিতেন না। অবশ্য, না শিখিলে কিছুই পারা যায় না—ইহাতেও অত দুঃখের কথা নাই, কিন্তু বড় দুঃখের কথা এই যে, তাঁহারা নিজেদের এই অক্ষমতাটা বন্ধু-বান্ধবের কাছে আহ্লাদ করিয়া বলিতে ভালবাসিতেন। লজ্জার পরিবর্তে শ্লাঘাবোধ করিতেন অর্থাৎ ভাবটা এই যে, এত ইংরাজি শিখিয়াছি যে, বাঙ্গালায় একখানা চিঠি লিখিবার বিদ্যাটুকু পর্যন্ত আয়ত্ত করিবার সময় পাই নাই। জানি না, এ-রকম হাজার টাকার বাঙালী আরো কত আছেন, কিন্তু এটা যদি তাঁহারা জানিতেন যে, মাতৃভাষা না শিখিয়াও ঐ অতটা পর্যন্তই পারা যায়, কিন্তু তার ঊর্ধ্বে যাওয়া যায় না, ঐ চলা-বলা-খাওয়া-টাকা রোজগার পর্যন্তই হয়, আর হয় না; যথার্থ বড় কাজ, যা করিলে মানুষ অমর হয়, যাঁর মৃত্যুতে দেশে হাহাকার উঠে, তেমন বড় কর্মী কিছুতেই হওয়া যায় না, তাহা

হইলে নিজেদের ঐ অক্ষমতার পরিচয় দিবার সময় অমন করিয়া হাসিয়া আকুল হইতে পারিতেন না।

তাই আজ আমি এই কথাটাই আপনাদিগকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইতে চাই, যে, যথার্থ স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার সাক্ষাৎ মাতৃভাষা ভিন্ন ঘটে না, যথার্থ বড় চিন্তার ফল সংগ্রহ করিবার পথ মাতৃগৃহদ্বারের ভিতর দিয়াই, বাঙ্গালী যখন বাঙ্গালী, সে যখন সাহেব নয়, তখন, বিলাতি ভাষার মস্তবড় ফাটকের সম্মুখে যুগযুগান্তর দাঁড়াইয়াও কোনদিনই সে পথের সন্ধান পাইবে না।

এ কথা শুধু ইতিহাসের দিক দিয়াই সত্য নহে, মনোবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানের দিক দিয়াও সত্য।

কেন যে আজ পর্যন্ত জগতে, মানুষ যত-কিছু বড় চিন্তা করিয়া গিয়াছেন সে সমস্তই মাতৃভাষায়, বৈষয়িক উন্নতির অবনতির ফলে এক-একটা ভাষা সাময়িক প্রাধান্য এবং ব্যাপকতা লাভ করা সত্ত্বেও এবং সেই ভাষা সর্বতোভাবে আয়ত্তাধীন থাকা সত্ত্বেও কেন যে চিন্তাশীল ভাবুকেরা নামের লোভ ত্যাগ করিয়া নিজেদের অমূল্য চিন্তারাশি মাতৃভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কেন মাতৃভাষা ভিন্ন অপরের ভাষায় বড় চিন্তার অধিকার জন্মায় না, এই সত্যটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে গেলে, প্রথমতঃ ভাষাবিজ্ঞানের দুটো মূল কথা মনে করিয়া লওয়া উচিত।

ব্রহ্মাণ্ডে আছে কি? আছে আমার চৈতন্য এবং তদ্বিষয়ীভূত যাবতীয় পদার্থ। অন্তর্জগৎ এবং বাহ্যজগৎ। উভয়ে কি সম্বন্ধ এবং সে সম্বন্ধ সত্য কিংবা অলীক, সে আলাদা কথা। কিন্তু এই যে পরিচয় গ্রহণ, একের উপরে অপরের কার্য, ইহাই মানবের ভাব এবং চিন্তা। এবং এই পদার্থ নিশ্চয়ই মানবের চিন্তার বিষয়। এমনি করিয়াই সমস্ত স্থূল বিশ্ব একে একে মানবের ভাব-রাজ্যের আয়ত্ত হইয়া পড়ে। ঘর-বাড়ি, সমাজ, দেশ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ এক-একটি চিন্তার জন্মদান করিয়া ইহারাই মানব-চিত্তে এক-একটি ভাব উৎপন্ন

করে। অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ উভয়েই বিচিত্র তথ্য ও ঘটনায় ভরিয়া উঠে। উভয় জগতের এইসব তথ্য ও ঘটনা ছাড়া মানুষ ভাবিতেই পারে না। অর্থাৎ ইহাদের দ্বারাই মানবচিত্ত আন্দোলিত হইয়া ইহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এক কথায় ইহারা ভাব ও ধারণার কারণও বটে, ইহারা তাহার বিষয়ও বটে।

এইবার মনের মধ্যে পদার্থের পরীক্ষা হইতে থকে। ভাব ও চিন্তার কাছে তাহাদের প্রকৃতি ও স্বরূপ ধরা পড়ে, ধর্ম ও গুণের হিসাবে নানা লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া বাহ্যজগৎ এইবার ধীরে ধীরে সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট হইতে থাকে।

মানবের ভাব ও চিন্তাই যাবতীয় পদার্থে গুণের আরোপ করে। সে কি, আর একটার সহিত তাহার কি প্রভেদ স্থির করিয়া দেয়। তারপর পদার্থের সহিত পদার্থের তুলনা করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লক্ষণ নির্ণয় করিয়া ধর্মবিশিষ্ট করিয়া আমরা তাহাদের ধারণা-কার্য সম্পূর্ণ করি।

বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের মানব-চিন্তা-প্রণালী পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায়, এই চিন্তা-প্রণালী কয়েকটা সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। একই নিয়মে মানবের চিন্তারাশি পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

যেমন বাহ্যজগতে দেখা যায়, কোন দুটি বস্তু একই সময়ে একই স্থান অধিকার করিতে পারে না অন্তর্জগতেও ঠিক তাই। সেখানেও কোন দুটি বস্তু এক সঙ্গেই চিত্ত অধিকার করিতে পারে না। সেই জন্যই আমরা কোনমতেই এক সঙ্গে একই আয়াসে দুটি বস্তুর পরিচয়-লাভ কিংবা একটি বস্তুর দুটি গুণনির্ণয় করিতে পারি না। আমরা বিষয় ভাগ করিয়া একটি একটি করিয়া লক্ষণ স্থির করি। অর্থাৎ চিন্তার কার্য ক্রমশঃ নিষ্পন্ন হয়। অন্তর্জগতে মন যেমন দুটি বস্তু বা দুটি গুণ এক সঙ্গে গ্রাহ্য করে না, বাহ্যজগতে পদার্থও তেমনি তাহার সব-কটা গুণই একই সময়ে মানব-চিত্তের কাছে প্রকাশ করে না। যুবতী

রমণীর রূপ শিশুচিত্তের কাছে ধরা দেয় না। সে রূপের মূল্য উপলব্ধি করিবার জন্য শিশুচিত্তকে একটা নির্দিষ্ট বয়সের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়।

এই জন্য ভাবের ক্রমিক বিকাশ, বয়োবৃদ্ধি ও ধারণা-শক্তির বিকাশের উপর নির্ভর করে। এবং তাহার উপর ভাব ও চিন্তার সংখ্যাবৃদ্ধি হয়।

কিন্তু চিন্তা-পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা সাধারণ নিয়ম এই যে, পুরাতন ভাব ও ধারণার ভিত্তি অবলম্বন না করিয়া প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত চিন্তাস্রোতে গা ভাসান না দিয়া মানব-চিত্ত কোনমতেই নতুন ধারণা বা নূতন ভাব আয়ত্ত করিতে পারে না। জ্ঞাত ও সুনির্দিষ্ট পদার্থ নিয়ে অতীত দিনে যেভাবে চিত্তকে নাড়া দিয়া তাহার গুণ ও ধর্মের কাহিনী জানাইয়া দিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে মনের মধ্যে যে জ্ঞান জন্মিয়া রহিয়াছে, সেই জ্ঞানের সহিত তুলনা না করিয়া, তাহাদিগকে ব্যবহার না করিয়া কোনমতেই মানুষ পদার্থের নূতন লক্ষণ ও ধর্মের পরিচয় পাইতে পারে না।

যেমন করিয়া এবং যে-যে উপায়ে শিশুচিত্তে প্রথম চৈতন্যের বিকাশ ঘটিয়াছিল জানিয়া এবং না জানিয়া যে-সকল পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সেই তরুণ চিত্ত, ভাব, চিন্তা ও ধারণায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যে-সমস্ত জল, হাওয়া ও আলোক পাইয়া তাহার জ্ঞানের অঙ্কুর পল্লবিত হইয়া আজ শাখা-প্রশাখায় বড় হইয়াছে, সে জল, হাওয়া, আলোককে বাদ দিয়া আর একটা অভিনব প্রণালীতে মানবচিত্ত কোনমতেই নূতন জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। অর্থাৎ যেমন করিয়া সে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া চিন্তা করিতে শিখিয়াছিল মরিবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে সে-পথ ছাড়িয়া যাইতে পারে না—পুরাতন জ্ঞানকে অস্বীকার করিয়া পুরাতন পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া কাহারোই নূতন জ্ঞান, নূতন চিন্তা জন্মে না।

আরো একটা কথা। ভাব ও চিন্তা যেমন ভাষার জন্মদান করে, ভাষাও তেমনি চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত, সুসম্বন্ধ ও শৃঙ্খলিত করে। ভাষা ভিন্ন ভাবা যায় না। একটুখানি

অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে-কোন একটা ভাষা মনে মনে আবৃত্তি করিয়াই চিন্তা করে—যেখানে ভাষা নাই, সেখানে চিন্তাও নাই।

আবার এইমাত্র বলিয়াছি, পুরাতন নিয়মকে উপেক্ষা করিয়া, পুরাতনের উপর পা না ফেলিয়া নূতনে যাওয়া যায় না—আবার ভাষা ছাড়া সুসম্বন্ধ চিন্তাও হয় না—তাহা হইলে এই দাঁড়ায় বাঙ্গালী বাংলা ছাড়া চিন্তা করিতে পারে না, ইংরাজ ইংরাজি ছাড়া ভাবিতে পারে না। তাহার পক্ষে মাতৃভাষা ভিন্ন যথার্থ চিন্তা যেমন অসম্ভব, বাঙ্গালীর পক্ষেও তেমনি। তা তিনি যত বড় ইংরাজি-জানা মানুষই হউন। বাংলা ভাষা ছাড়া স্বাধীন, মৌলিক বড় চিন্তা কোনমতেই সম্ভব হইবে না।

এ-সব বিজ্ঞানের প্রমাণিত তথ্য। ইহার বিরুদ্ধে তর্ক চলে না। চলে শুধু গায়ের জোরে, আর কিছুতে না।

যে ভাষায় প্রথম মা বলিতে শিখিয়াছি, যে ভাষা দিয়া প্রথম এটা ওটা সেটা চিনিয়াছি, যে ভাষায় প্রথমে 'কেন' প্রশ্ন করিতে শিখিয়াছি, সেই ভাষার সাহায্য ভিন্ন ভাবুক, চিন্তাশীল কর্মী হইবার আশা করা আর পাগলামি করা এক। তাই যে কথা পূর্বে বলিয়াছি তাহারি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি, পরভাষায় যত বড় দখলই থাক, তাহাতে ঐ চলা-বলা-খাওয়া, নিমন্ত্রণ রক্ষা, টাকা রোজগার পর্যন্তই হয়, এর বেশি হয় না, হইতে পারে না।

তারপরে সাহিত্য। আমার মনে হয়, সর্বত্র এবং সকল সময়েই ভাষা ও সাহিত্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত। যেন পদার্থ ও তাহার ছায়া। অবশ্য প্রমাণ করিতে পারি না যে, পশুদের ভাষা আছে বলিয়া সাহিত্যও আছে। যাঁহারা 'নাই' বলেন, তাঁহাদের অস্বীকার খণ্ডন করিবার যুক্তি আমার নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে, ভাষা আছে কিন্তু সাহিত্য নাই।

ভাষা-বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, মানবের কোন্ অবস্থায় তাহার প্রথম সাহিত্য-সৃষ্টি তাহা বলিবার জো নাই, খুব সম্ভব, যেদিন হইতে তাহার ভাষা, সেই দিন হইতে তাহার সাহিত্য। যেদিন হইতে সে তাহার হত দলপতির বীরত্ব-কাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, যেদিন হইতে প্রণয়ীর মন পাইবার অভিপ্রায়ে সে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই তাহার সাহিত্য।

তাই যদি হয়, কে জোর করিয়া বলিতে পারে পশু-পক্ষীর ভাষা আছে অথচ সাহিত্য নাই? আমি নিজে অনেক রকমের পাখি পুষিয়াছি, অনেক বার দেখিয়াছি তাহারা প্রয়োজনের বেশি কথা কহে, গান গাহে। সে কথা, সে গান আর একটা পাখি মন দিয়া শুনে। আমার অনেক সময় মনে হইয়াছে, উভয়েই এমন করিয়া তৃপ্তির আস্বাদ উপভোগ করে, যাহা ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির অতিরিক্ত আর কিছু। তখন, কেমন করিয়া নিঃসংশয়ে বলিতে পারি ইহাদের ভাষা আছে, গান আছে কিন্তু সাহিত্য নাই? কথাটা হয়ত হাসির উদ্রেক করিতে পারে, পশু-পক্ষীর সাহিত্য! কিন্তু সেদিন পর্যন্ত কে ভাবিতে পারিয়াছিল গাছপালা সুখদুঃখ অনুভব করে? শুধু তাই নয়, সেটা প্রকাশও করে। তেমনি হয়ত, আমার কল্পনাটাও একদিন প্রমাণ হইয়া যাইতেও পারে।

যাক ও কথা। আমার বলিবার বিষয় শুধু এই যে, ভাষা থাকিলেই সাহিত্য থাকা সম্ভব; তা সে যাহারই হোক এবং যেখানেই হোক। অনুভূতির পরিণতি যেমন ভাব ও চিন্তা, ভাষার পরিণতিও তেমনি সাহিত্য। ভাব প্রকাশ করিবার উপায় যেমন ভাষা, চিন্তা প্রকাশ করিবার উপায়ও তেমনি সাহিত্য। জাতির সাহিত্যই শুধু জানাইয়া দিতে সক্ষম সে জাতির চিন্তাধারা কোন্ দিকে কোথায় এবং কতদূরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। দর্শন, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, এমন কি যুদ্ধবিদ্যার জ্ঞান ও চিন্তাও দেশের সাহিত্যই প্রকাশ করে।

একবার বলিয়াছি, ভাষা ছাড়া চিন্তা করা যায় না। তাই জগতে যাঁহারা চিন্তাশীল বলিয়া খ্যাত,তা সে চিন্তার যে-কোন দিকই হউক, মাতৃভাষায় দেশের সাহিত্যে তাঁহারা ব্যুৎপন্ন এ কথা বোধ করি অসংশয়ে বলা যায়।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের প্রতি চোখ ফিরাইলে এই সত্য অতি সহজেই সপ্রমাণ হয়। তাঁহারা দর্শন বা বিজ্ঞান লইয়াই থাকেন, লোকে তাঁহাদের চিন্তার ঐ দিকটার পরিচয় পায়, কিন্তু, দৈবাৎ কোন প্রকাশ পাইলে, বৈজ্ঞানিকের অসাধারণ সাহিত্য-ব্যুৎপত্তি দেখিয়া লোকে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যায়। বিলাতের হক্‌সলি, টিন্‌ডল, লজ, ওয়ালেশ, হেল্‌ম হোজ, হেকেল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা খুব বড় সাহিত্যিক। আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রও কোন খ্যাত সাহিত্যিক অপেক্ষা ছোট নহেন।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় কিছুই থাকে না, যদি এই কথাটা মনে রাখা যায়। সাহিত্যকে বাদ দিয়া যাঁহারা বিজ্ঞান আলোচনা করেন, তাঁহারা বিজ্ঞানবিৎ হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু বাহিরের সংসার তাঁহাদের পরিচয় পায় না। কারণ, ভাষা সাহিত্যকে অবহেলা করার সঙ্গে সঙ্গেই, স্বাধীন চিন্তাশক্তিও অন্তর্ধান করে।

এইবার সাহিত্যের দ্বিতীয় অংশের কথা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব। কিন্তু তাহার পূর্বে এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা কি? তাহা শুধু এই যে, মাতৃভাষা শিক্ষার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। পরের ভাষায় সংসারের সাধারণ মামুলি কর্তব্যই করা যায়, কিন্তু বড় কাজ, বড় কর্তব্যের পথ মায়ের উঠানের উপর দিয়াই—তাহার আর কোন পথ নাই। ইতিহাস ও বিজ্ঞান এই সত্যই প্রচার করে।

কিন্তু সাহিত্য বলিতে সাধারণত কাব্য ও উপন্যাসই বুঝায়। সে যে নিছক কাল্পনিক বস্তু। একশ্রেণীর কাজের লোক আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস যাহা কল্পনা তাহাই মিথ্যা এবং মিথ্যা কোন দিন কাজে লাগিতে পারে না। সেটা পড়িয়া নিশ্চয়ই জানিয়া রাখা উচিত, বিলাতের রাজা অত নম্বরের হেনরীর কতগুলি ভার্যা ছিল এবং অমুক অমুক সালে, তাহাদের অমুক অমুক কারণে, অমুক অমুক দশা ঘটিয়াছিল। কারণ, কথাগুলি সত্য কথা এবং দশাগুলি সত্যই ঘটিয়াছিল। কিন্তু, কি হইবে জানিয়া বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথের ভার্যা সূর্যমুখীর কি দশা ঘটিয়াছিল এবং কেন ঘটিয়াছিল? তাহা ত সত্যই ঘটে নাই—লেখক

বানাইয়া বলিয়াছেন মাত্র। বানানো কথা পড়িয়া বড় জোর সময়টাই কাটিতে পারে। কিন্তু, আর কোন্ কাজ হইবে? তাঁহাদের মতে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই সত্য, কিন্তু যাহা হয়ত ঘটিলে ঘটিতে পারিত কিন্তু ঘটে নাই, তাহা মিথ্যা। কিন্তু বস্তুতঃ তাই কি? এইখানে কবির অমর উক্তি উদ্ধৃত করি–

ঘটে যা তা সব সত্য নয়, কবি তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

বস্তুতঃ ইহাই সত্য এবং বড়রকমের সত্য। ইংরাজেরা যাহাকে 'এ হায়ার কাইন্ড অফ ট্রুথ' বলেন, ইহা তাহাই। সীতাদেবী যথার্থই শ্রীরামচন্দ্রকে অতখানি ভাল বাসিয়াছিলেন কিনা, ঠিক অমনি পতিগতপ্রাণা ছিলেন কিনা, যথার্থই রাজপ্রাসাদ, রাজভোগ ত্যাগ করিয়া বনে-জঙ্গলে স্বামীকে অনুসরণ করিয়াছিলেন কিনা, কিংবা ঐতিহাসিক প্রমাণে তাঁহাদের বাস্তব সত্তা কিছু ছিল কিনা, ইহাও তত বড় সত্য নয়, যত বড় সত্য কবির মনোভূমিতে জন্মিয়া রামায়ণের শ্লোকের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জানকী দেবী হউন, মানবী হউন, সত্য হউন, রূপক হউন, যাহা ইচ্ছা হউন; অত গভীর পতিপ্রেম তাঁহাতে সম্ভব-অসম্ভব যাহাই হউক, কিছুমাত্র আসে যায় না; যখন, ঐ গভীর দাম্পত্য-প্রেমের ছবি কবির হৃদয়ে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারিয়াছে এবং যুগ-যুগান্তর নর-নারীকে আদর্শ দাম্পত্য প্রেমে দীক্ষা দিয়া আসিয়াছে, ইহাই সত্য। সত্যকার অযোধ্যা সত্যকার রাম-সীতা অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে সত্য। অযোধ্যা হয়ত একটি রাম, একটি সীতাতে সত্য, কিন্তু কবির কল্পনায় যে রাম-সীতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, হয়ত তাহা আজ পর্যন্ত কোটি কোটি রাম-সীতাতে সত্য হইয়াছে।

সেদিন স্নেহলতার আত্মবিসর্জনকাহিনী সংবাদপত্রে পড়িয়াই মনে হইয়াছিল ঠিক এমনি করুণ, এমনি স্বার্থত্যাগের চিত্র কিছুদিন পূর্বে গল্প-সাহিত্যে পড়িয়াছিলাম। সে

মেয়েটিও দরিদ্র পিতাকে দুঃখ-কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিবার জন্যই আত্মবিসর্জন করিয়াছিল। তাহারও বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইতেছিল এবং পাত্র পাওয়া যাইতেছিল না।

সংবাদপত্রের কাহিনী ঐ একটি স্নেহলতাতেই সত্য, কিন্তু কবির কল্পনায় যে মেয়েটি আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহা হয়ত শত-সহস্রে সত্য।

স্নেহলতা শিক্ষিতা ছিলেন, কে জানে তিনি এই কাহিনী পড়িয়াছিলেন কি না, এবং স্বার্থত্যাগ-মন্ত্র ইহাতেই পাইয়াছিলেন কি না!

আমার বিশ্বাস কিন্তু এই। আমার নিশ্চয় মনে হয়, তিনি লেখাপড়া না জানিলে, সাহিত্যচর্চা না করিয়া থাকিলে কিছুতেই এ শক্তি, এ বল নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেন না। কবির কল্পনা এমনি করিয়াই সত্য হয়, কবির কল্পনা এমনি করিয়াই কাজ করে।

দেশের কল্পনায় দেশের সাহিত্য, দেশের ইতিহাস বড় হউক, জীবন্ত হউক, সত্য হউক, সুন্দর হউক, এই প্রার্থনাই আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করিতেছি। প্রত্যেক সুসন্তান অকপটে মাতৃভাষার সেবা করুন, এইটুকু মাত্র ভিক্ষা আপনাদের কাছে সবিনয়ে করিতেছি। কিন্তু কি করিলে সাহিত্য ঠিক অমনটি হইবে, সে পরামর্শ দিবার স্পর্ধা আমার নাই। শুধু এইটুকু মাত্র বলিতে পারি, যাহা সত্য বলিয়া মনে হইবে, অন্তরের সহিত যাহাকে সুন্দর বলিয়া বুঝিবেন, নিজের সাধ্যমত সেই পথ ধরিয়াই চলিবেন—তার পরে ফল ভবিষ্যতের হাতে।

যাঁহারা বড় সাহিত্যিক, বড় সমালোচক তাঁহারা পরামর্শ দিতেছেন, উপদেশ দিতেছেন ইংরাজি ভাব, ইংরাজি ভঙ্গী ত্যাগ করিয়া খাঁটি স্বদেশী হইতে; আমি নিজেও একজন অতি ক্ষুদ্র নগণ্য সাহিত্যসেবক, কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি, তাঁহাদের পরামর্শ, তাঁহাদের উপদেশ যে ঠিক কি, তাহা এখন পর্যন্ত বুঝি নাই।

কে কোথায় হ্রস্ব-ই-কার স্থানে ঈ দিয়াছেন, কে কোথায় 'অ'-কারের পরিবর্তে 'ও'-কার ব্যবহার করিয়া ভয়ানক অন্যায় করিয়াছেন, কে কোথায় কোন্ বিধবা বঙ্গনারীকে দিয়া এক মুমূর্ষু হতভাগ্য পরপুরুষের মুখে জল দিয়া সাহিত্যে বিষম কুরুচি টানিয়া আনিয়াছেন, এই-সব লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে মহা তোলপাড় হইতেছে, কেন হইতেছে, যথার্থ কি তাহাতে দোষ, কি হইলে ঠিকটি হইত, এ-সব খুঁটিনাটি আয়ত্ত করিয়া তাহাতে মতামত দিবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি কিছুই আমার নাই।

কোন সাহিত্য-সেবককেই আমি উপদেশ দিতে পারি না, এই কর কিংবা এই করা উচিত।

শুধু এইটুকু বলি, হৃদয়ের মধ্যে এই সত্য জাগাইয়া রাখিয়া সাহিত্যসেবা করুন, যেন আপনার সেবা মাতৃভাষার দ্বার দিয়া স্বদেশবাসীকে কল্যাণের পথে লইয়া যায়। তখন কি উচিত, কি উচিত নয়, তাহা দেশের হৃদয় ও প্রাণই বলিয়া দিবে।